অল্প-স্বল্প গল্প

কাইউম পারভেজ

।। সন্মানের মানুষটা যথাযথ সন্মানটা পেলেন না ।।

১৯৭১-এর মার্চ্চ। বিস্ফোরোন্মুখ পূর্ব-পাকিস্তানের উত্তাল জনতা। পাক সামরিক জান্তাদের অত্যাচার নিপীড়ন তখন চরমে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শাসক-শোষক গোষ্ঠীর সাথে তখনো আলোচনার চেষ্টা করে যাচ্ছেন ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া নির্ধারণের জন্য। ওদিকে ওরা অনড়। কোনভাবেই ক্ষমতা দেবে না। আলোচনা ভেঙ্গে গেল। সাধারণ মানুষকে গুলি করে হত্যার সংখ্যা বাড়তে লাগলো। বঙ্গবন্ধু সর্বস্তরে অসহযোগের ডাক দিলেন পহেলা মার্চ্চ থেকে। গোটা পূর্বপাকিস্তান তখন চলছে তাঁর মৌখিক নির্দেশে। ঘোষণা এলো সাতই মার্চ্চ বঙ্গবন্ধু সোহরোয়ার্দী উদ্দ্যানে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন। সবাই মনে মনে প্রস্তুতি নিয়ে ফেললো তাঁর পরবর্তী নির্দেশ শোনার জন্য। কাওকে বলতে হয়নি, কাওকে টাকা পয়সা দিতে হয়নি কাওকে ডাকতে হয়নি - আবালবৃদ্ধবনিতা ছুটছে সোহরোয়ার্দী উদ্দ্যানের দিকে। এমন জনস্রোত এ মাটি আগে কখনো দেখেনি। কবি নির্মলেন্দু গুণের ভাষায় -
একটি কবিতা পড়া হবে, /তার জন্য কী ব্যাকুল প্রতীক্ষা মানুষের/ কখন আসবে কবি?/কখন আসবে কবি?
শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে,/রবীন্দ্রনাথের মতো দৃপ্ত পায়ে হেঁটে/অতঃপর কবি এসে - জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন।/তখন পলকে দারুন ঝলকে তরীতে উঠিল জল,/হৃদয়ে লাগিল দোলা, /জনসমুদ্রে জাগিল জোয়ার

সকল দুয়ার খোলা। /কে রোধে তাহার বজ্রকণ্ঠ বাণী?/গণসূর্য্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শোনালেন তাঁর অমর কবিতাখানি/"এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম/এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"। আঠারো মিনিট ব্যাপি এ ভাষণে উদ্বুদ্ধ হয়েই স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য ঝাপিয়ে পড়েছিলেন আপামর বাঙালি জাতি। এ ভাষণের জন্যেই বঙ্গবন্ধুকে 'রাজনীতির কবি' খেতাবে আখ্যায়িত করেছিল জাতি।

সামরিক জান্তার দখলে তখন রেডিও টেলিভিশন। তারা কড়া হুকুম জারি করলো রেডিও টেলিভিশনের কেউ শেখ মুজিবুর রহমানের সাতই মার্চ্চের ভাষণ রেকর্ড এবং প্রচার করতে পারবে না। পরবর্তীতে প্রচার করা হলেও ঐদিন অর্থাৎ সাতই মার্চ্চে সেই সোহরোয়ার্দীর জনস্রোত ছাড়া আর কেউ সে ভাষণ শুনতে পারেন নি। তাহলে মানুষ সেই ভাষণ পরে শুনলো কেমন করে?

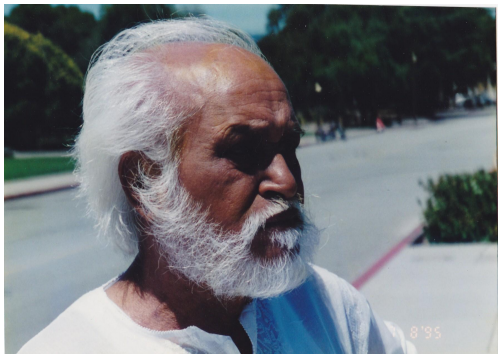

পাক-সরকারের নিষেধাজ্ঞাকে উপেক্ষা করে তৎকালীন পাকিস্তান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান এ এইচ এম সালাহউদ্দিন ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম আবুল খায়ের এমএনএ ভাষণটি ধারণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এম আবুল খায়ের এমএনএ ছিলেন তৎকালীন ফরিদপুর জেলার পাঁচ আসনের (বর্তমান গোপালগঞ্জ ১ আসন) নির্বাচিত সংসদ সদস্য (প্রখ্যাত নজরুল সঙ্গীত শিল্পী এবং ছায়ানটের সাধারণ সম্পাদক খায়রুল আনাম শাকিলের বাবা)। তাঁদের এ কাজে সাহায্য করেন অভিনেতা আবুল খায়ের। তিনি তখন সরকারের ফিল্ম ডিভিশনের ডিএফপি কর্মকর্তার পাশাপাশি একজন অভিজ্ঞ মুভি ক্যামেরাম্যান। তাঁদের সঙ্গে আরো ছিলেন অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ান এনএইচ খন্দকার।বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতার সময় এমএনএ আবুল খায়েরের তত্ত্বাবধানে টেকনিশিয়ান এনএইচ খন্দকার মঞ্চের নিচ থেকে ভাষণটির অডিও ধারণের সিদ্ধান্ত নেন। অন্যদিকে অভিনেতা আবুল খায়ের মঞ্চের এক পাশ থেকে একটি মুভি ক্যামেরা নিয়ে ঐ ভাষণের চিত্রধারণ করেন। কিন্তু ঐ সময়ের মুভি ক্যামেরাগুলো আকারে বড় হওয়ার কারণে আবুল খায়েরের একার পক্ষে সেটা নাড়াচাড়া করা বেশ

কষ্টকর হয়ে পড়েছিল, ফলে এক জায়গায় স্থির থেকে তিনি লুকিয়ে ছাপিয়ে যতটুকু পেরেছেন ততটুকুই ধারণ করেছিলেন। আর এ কারণেই সাতই মার্চ্চে বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত আঠারো মিনিটের ভাষণের মাত্র দশ মিনিটের একটি ভিডিও চিত্র আমরা এখন দেখতে পাই। পরদিন বাঙালি বেতারকর্মী ও আপামর জনতার দাবির প্রেক্ষিতে রেকর্ডকৃত ভাষণটি রেডিওতে প্রচার করা হলেও টিভিতে ভিডিওটি দেখানো সম্ভব হয়নি।

পরবর্তীতে ১৭ মার্চ্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে এ ধারণকৃত অডিও-ভিডিও তাঁকে উপহার দেওয়া হয়েছিল এবং মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময় এর কয়েকটি রেকর্ডকৃত কপি ভারতে পাঠানো হয়, সেখান থেকে বিশ্বখ্যাত রেকর্ড কোম্পানি এইচএমভির উদ্যোগে এ ভাষণের তিন হাজার কপি বিনামূল্যে বিভিন্ন জায়গায় বিতরণ করা হয়েছিল।
সেদিন যদি অভিনেতা আবুল খায়ের সাতই মার্চ্চের ঐতিহাসিক ভাষণটি মুভি ক্যামেরায় রেকর্ড করতে না পারতেন বা ব্যর্থ হতেন তবে বিশ্ব কোনদিনই সে রাজনীতির মহাকাব্যের গর্জনটা দেখতে পেতো না। যে মহাকাব্যে পাকিস্তানের চব্বিশ বছরের শোষণ, নিষ্পেষণ, বর্বরতা, নির্মমতার ট্রাজিক ইতিহাস রয়েছে। বাঙালির চব্বিশ বছরের নিদারুণ দু:খের বর্ণনা রয়েছে। সর্বোপরি পাকিস্তানের দু:শাসন থেকে বাঙালির মুক্তির নির্দেশনার অমূল্য উপাখ্যান রয়েছে এই ভাষণে। সেই অমূল্য ভাষণটি গত ৩০ অক্টোবর, ২০১৭ ইউনেস্কো ঐতিহাসিক হেরিটেজ-এর দলিল হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। বিশ্বের অন্যান্য মূল্যবান ভাষণের সাথে বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চ্চের এ ভাষণটি হেরিটেজ হিসেবে সংরক্ষণ করেছে জাতিসংঘ। এ প্রসঙ্গে আরো কিছু বলার আছে যা খানিক পরে আলোচনা করছি।

ফিরে যাই অভিনেতা আবুল খায়ের প্রসঙ্গে। বন্ধুমহলে 'খয়ের মাষ্টার' নামে পরিচিত ছিলেন তিনি। কোন এক সময়ে তিনি বঙ্গবন্ধুর সন্তানদের গৃহশিক্ষক ছিলেন - তাই খয়ের মাস্টার। অভিনেতা আবুল খায়ের আশির দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত টিভি নাটকের ছোটখাটো চরিত্রে অভিনয় করতেন। হুমায়ূন আহমেদের 'এইসব দিনরাত্রি'তে সুখী নীলগঞ্জ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে মাস্টারের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় সবাইকে তাক লাগিয়ে দেয়। প্রথমদিকে ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও পরে দর্শকপ্রিয়তায় হুমায়ূন আহমেদ চরিত্রটির পরিধি বাড়িয়ে দেন। এরপর 'বহুব্রীহি'র দাদা, 'আজ রবিবারে'র বাবা, 'পিতৃত্বে' র গ্রাম্য পিতা চরিত্রে অভিনয় করে আবুল খায়ের দর্শক হৃদয়ে অমর হয়ে আছেন।
তিনি প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার ঋতিক কুমার ঘটকের পরিচালিত 'তিতাস একটি নদীর নাম' চলচ্চিত্রেও অভিনয় করেছেন। এছাড়া, চলচ্চিত্রে অবদানের জন্য তিনি চারবার জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অর্জন করেন। ২০০১ সালে এই ঐতিহাসিক মানুষটি মৃত্যু বরণ করেন।

তাঁর সাথে কাজ করার এক দুর্লভ সুযোগ হয়েছিল আমার ১৯৮২-৮৩ তে। আমি তখন কৃষি মন্ত্রনালয়ের অধীনে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) গাজীপুরে উর্দ্ধতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা। কবি আবূ জাফর ওবায়দুল্লাহ তখন কৃষি সচিব। চরমপত্রখ্যাত এম আর আখতার মুকুল তখন সেই মন্ত্রনালয়ের যুগ্ম সচিব। এঁরা দুজনাই খয়ের মাস্টারের ঘনিষ্ট। তখন আবুল খায়েরের দুর্দিন। আর্থিক অনটন। এই দুই আমলাবন্ধু আবুল খায়েরকে কিছু সাহায্য করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেন। বললেন ব্রি-র কাছে এফএও-র দেয়া কিছু র'ফিল্ম আছে যা দিয়ে ব্রি- কৃষকদের জন্য ধানচাষের আধুনিক প্রযুক্তি নিয়ে একটি ছবি বানাতে চায়। আপনি ওই ছবিটা বানিয়ে দিন। আমরা মন্ত্রনালয় থেকে যাবতীয় খরচ বহন করবো।

আবুল খায়ের সেসময়ের প্রখ্যাত ক্যামেরাম্যান মোবিনকে নিয়ে ব্রি-তে এলেন। ব্রি থেকে আমাকে দায়িত্ব দেয়া হলো পুরো প্রকল্পটির সরজমিনে তদারকী এবং কারিগরী সহায়তা দেয়ার। আমি আর আবুল খায়ের মিলে সিনেমার স্ক্রীপ্ট তৈরী করলাম। অতঃপর আমাদের পরিকল্পনা অনুয়ায়ী ছবির সুটিং শুরু হয়ে গেল। ছবির নাম দিয়েছিলাম 'বাঁশী"। বাঁশীতে আছে প্রগতিবাদী এক ধানচাষীর জীবন কাহিনী, আছে তার ছোট থেকে বড় হবার চিত্র, আছে

উচ্চফলনশীল ধান চাষে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির সাফল্য। এটাই ছবি বানানোর আমার প্রথম অভিজ্ঞতা। খুবই এক্সাইটিং।

ছবির চিত্রগ্রহণ শেষ। এবার এডিটিং। খায়ের চাচা বললেন - জামাইমিয়াঁ - এবার কিন্তু তোমার একার কাজ আমি আর নাই। মানে? মানে হইলো গিয়া এ ছবির এডিটিং হবে ডিএফপিতে (ডিপার্টমেন্ট অব ফিল্মস এ্যানড পাবলিকেশনস)। সেখানে তোমাকে প্রতিটা মুহূর্ত থাকতে হবে যেন কারিগরী তথ্যের কোন ভুল না থাকে। ছবির টেকনিক্যাল সিকোয়েন্স যেন নির্ভূল হয়। একনাগাড়ে তিন সপ্তাহ ব্রি- ডিএফপি করেছি এডিটিংয়ের কাজে। সেখানে আর এক ব্যক্তিত্বের সাথে পরিচিত হলাম। ফিল্ম এডিটিংয়ের নক্ষত্র সাইদুল আনাম টুটুল। তিনি তখন সবে পুনা থেকে ডিগ্রি নিয়ে এসেছেন। তাঁর সাথেই আমার প্রতিদিনের কাজ। ফিল্ম এডিটিং সম্পর্কে কোন ধারণা না থাকাতে বেকুবের মত তাঁকে প্রশ্ন করলাম এ এডিটিংয়ের কাজে আমাকে কেন থাকতে হবে? এটা কী এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়? টুটুল হাসলেন - বললেন একটা সিনেমা বা মুভির সাফল্য এবং সার্থকতা নির্ভর করে এডিটিংয়ের ওপর। বললেন ম্যাগগাইভার দেখেন না (তখন দেশে ম্যাগগাইভারের সময়)। বললাম দেখি। ধরুন দেখছেন ম্যাগগাইভার হেলিকপ্টার থেকে লাফ দিলেন। আসলে তো নায়করা কোন ঝুঁকিপূর্ণ এ্যাকশানে যান না। সে কাজটুকু করে দেন স্টান্টম্যানেরা। কেঁচি চালিয়ে জোড়া দিয়ে ওই স্টান্টম্যানের কাজটুকু সার্থক ভাবে লুকিয়ে দর্শককে দেখানোই হচ্ছে এডিটিং। সবাই জানলো দেখলো হেলিকপ্টার থেকে লাফ দিয়েছে ম্যাকগাইভার আসলে লাফটা দিলো স্টান্টম্যান। আপনারা তো যখন যা প্রয়োজন মনে করেছেন তা শ্যুট করেছেন কখনো একবার কখনো একাধিকবার । সেগুলো বাছ বিচার করে সবচে ভাল শটটি আমরা রাখবো। আর সেটা করতে গিয়ে কোন তথ্যের হের ফের যেন না হয় সেজন্য থাকছেন আপনি।

এ কাজটা করতে গিয়ে বুঝলাম একটি সিনেমার এডিটিং কত গুরুত্বপূর্ণ। বুঝলাম কেন এডিটিং এর জন্য জাতীয় পুরস্কার এমনকি অস্কারও দেয়া হয়।
আবার আসি সেই সাতই মার্চ্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণকে ইউনেস্কোর স্বীকৃতি দান এবং সে খুশীতে ১৮ নভেম্বর সোহরোয়ার্দী উদ্দ্যানে নাগরিক কমিটির নামে মহাসমাবেশের আয়োজনের কথায়। যদিও আয়োজকের নাম নাগরিক কমিটি তবে অনুষ্ঠানটি মূলতঃ পরিচালনা করেছেন ক্যাবিনেট সচিব মোহাম্মদ শফিউল আলম এবং রামেন্দু মজুমদার। যাঁরা বক্তব্য রেখেছেন অধিকাংশই আওয়ামী লীগের নেতানেত্রী শুধু অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, শ্যামলী নাসরিন চৌধুরীর মত দু একজন ছাড়া। এই মহতি অনুষ্ঠানটি দলীয়করণ- সরকারীকরণ না করলে কি চলতো না। সাধারণ মানুষ কী স্রোতের মত আসতো না? একাত্তরের সাতই মার্চ্চে কী আসে নাই? স্কুল কলেজ অফিস আদালতে চিঠি পাঠিয়ে স্কুল কলেজ থেকে কোমলমতি শিশু কিশোর কিশোরীদের এক রকম জোর করে হাজির না করলে কী চলতো না? এটা নিয়েও রাজনীতি করতে হবে। এটা নিয়েও শো ডাউন করতে হবে? যে ভাষণটা জাতিসংঘে সম্মানিত হলো কেন সেই অমূল্য ভাষণটির এত অবমাননা হলো? এই সমাবেশকে কী সার্বজনীন করা যেতো না? বিএনপিসহ সব রাজনীতির (জামায়াত ছাড়া) নেতা কর্মীকে সন্মান দিয়ে এখানে জড়ো করা যেতো না? তিনি যখন জাতির পিতা তখন তাঁর সব সন্তানদের কেন সন্মানজনক আমন্ত্রন জানানো হলো না। রাজনীতি বুঝি না তাই এর পেছনে রাজনীতির মারপ্যাঁচ কী আছে জানি না। আমি আমজনতা আমি যা বুঝি তাই বলি। শুধু বুঝলাম শীর্ষ সন্মানের মানুষটা যথাযথ সন্মানটা পেলেন না। তাঁকে প্রকারান্তরে যেন খাটো করা হলো।

আমরা রাজনীতির বাইরের মানুষ আমাদের কাছে তিনি যেমন ছিলেন তেমনই থাকবেন। কী একাত্তরে কী সতেরো তে। কী সাত মার্চ্চ কী ছাব্বিশ মার্চ্চ কী ষোল ডিসেম্বর। তিনি সব সময়ে যেমন আছেন তেমনি থাকবেন।